Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 383 – 393
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি

অমিত মজুমদার

ইমেইল : amitmazumdar56@gmail.com

Keyword

উপঢৌকন : উপহার, থান : বেদী, মারাংবরু : পর্বত দেবতা, নাইকি : পুরোহিত, টোটেম : গোত্র, বিন্দিয়া : টিপ, পরব : উৎসব, ধরমেশ : ওঁরাও দের দেবতা, বাপলা : বিবাহ, রায়বার : ঘটক, ডুঙা : পাত্র বিশেষ, দুয়ার খাঁদা : আশীর্বাদ, কঁকা : বোবা, গাবুর : সমাজপতি, দিকু : শত্রু।

Abstract

সভ্যতার আদিকাল থেকে ভারতের বুকে প্রবাহমান অরণ্যকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী আদিবাসী নামে পরিচিত। আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখলাম, আধুনিক সভ্য সমাজের অর্থলোলুপ আগ্রাসনে অরণ্যকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ মৃত্যু পথে ধাবিত হচ্ছে। যেভাবে দিন দিন নদীগর্ভ খালি করে ইট ও পাথরের সমন্বয়ে বহুতল প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে, তার ফলস্বরূপ অরণ্য ও নদীমাতৃক সভ্যতা ধ্বংস হচ্ছে। যে কোনো জনজাতি সমাদৃত হয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে; কিন্তু বর্তমানে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। সমাজ গঠনের মূল মেরুদন্ড হচ্ছে শিক্ষা আর এই শিক্ষা থেকেই আদিবাসী মানুষেরা অনেকাংশেই বঞ্চিত। বর্তমানে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা মিশ্রিত হওয়ায় আদিবাসী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূলত প্রকৃতি পূজারী; তাই তাঁরা অরণ্যকে দেবীরূপে পূজা করে। তাঁদের প্রধান উপাস্য দেবতা হলো মারাংবরু ও ধরমেশ। এছাড়াও বাঙ্গালীদের মতো তাঁদেরও বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে, শিশু থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পর্যন্ত এই উৎসবে সামিল হয়। আদিবাসী সমাজের শিশুরা প্রকৃতির কোলেই বেড়ে ওঠে। তাঁদের শৈশব, কৈশোর ও যৌবন মাঠে-ঘাটে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। যার ফলে তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং ওই সব শিশুরা হয়ে ওঠে কঠোর পরিশ্রমী। শিক্ষার হার আদিবাসী সমাজে কম হওয়ায় কারনে তাঁরা কৃষি মজুর, দিনমজুর ও চা- শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। যে কোন জনগোষ্ঠীর কাছে সমাজ গঠনের অন্যতম মাধ্যম বিবাহ ব্যবস্থা। এই বিবাহ ব্যবস্থা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তেমনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কমবেশি আট প্রকার বিবাহ ব্যবস্থা রয়েছে; যার দ্বারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এবং গড়ে ওঠে এক সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের শেষাবস্তায় অর্থাৎ মৃত্যুর পর বেশ কিছু বিধি-নিষেধদের মধ্য দিয়ে অশৌচ পালন করে থাকে। অশৌচ পর্ব সমাপ্ত হলে,পিণ্ড দান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। পরিশেষে এই কথা বলে শেষ করতে চাই, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী হয়েও আজও তাঁরা আশ্রিতের ন্যায় জীবন যাপন করছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও তাঁরা অবহেলিত এবং তাঁরা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই

আগামী দিনে আমাদের উচিত তাঁদের আপন করে নিয়ে নতুন পথের সন্ধানে এগিয়ে চলা। তবেই আগামী ভারতবর্ষ জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

Discussion

"আদি ভারতের অধিবাসী যারা
আদিবাসী নাম পেয়েছে,
সমাজে থেকেও সমাজচ্যুত,
ভালোবাসা কি পেয়েছে?
সভ্য সমাজ দলিত রূপে রেখেছে পদতলে,
ভুলে গেছে তাঁরা আমরা সবাই এক মায়ের-ই ছেলে।"

অরণ্যকেন্দ্রিক আদি সভ্যতার প্রবাহমান মানব গোষ্ঠী আজ আদিবাসী নামে সুপরিচিত। আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, আর্য উপনিবেশিকতা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁরা ভারতবর্ষকে ব্রহ্মণ্য বাদী সামাজিক শৃঙ্খলা উপঢৌকন দেয়। যে সমস্ত আদিবাসীরা এই সামাজিক শৃঙ্খলাকে মেনে নিয়েছিল তাঁরা দাসে পরিণত হয়, আর যারা মেনে নেয়নি তাঁরা দস্যু আখ্যায় ভূষিত হয়। আর এই দস্যুরাই হল আজকের আদিবাসী। এর থেকে বুঝতে পারি আজকের আদিবাসীরা ব্রাহ্মণ শাসকদের বিষবাষ্পের শিকার। 'আদিবাসী' - শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থে।[১] সভ্যতার আদি লগ্ন থেকেই অরণ্যভূমি ছিল শৈশব,কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের লীলা ক্ষেত্র। মায়ের সাথে সন্তানের যেমন আত্মিক টান, ঠিক তেমনই অরণ্যময়ী মায়ের সাথে তাঁদের অন্তরঙ্গতা আজও পরিলক্ষিত হয়। যুগ যুগ ধরে মাতৃরূপে অরণ্য তাঁর সকল সন্তানদের নিঃস্বার্থভাবে লালন পালন করে চলেছে। সন্তানদের আহারের জন্য বিভিন্ন সুস্বাদু ফল যেমনঃ- আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, পেয়ারা, এমনকি মধুর মতো অমৃত প্রদান করেছে এবং করছে। জ্বালানির জন্য গাছের শুকনো পাতা,কাঠ,এবং রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করার জন্য অরণ্য দিয়েছে মোম। অর্থ উপার্জনের জন্য অরণ্য দিয়েছে শালগাছের পাতা, ধুনো, শালফল,দাঁতন,গঁদ এবং রজনের মত মূল্যবান সম্পদ। অরণ্যকেন্দ্রিক এই আদিবাসী সভ্যতা সহজ,সরল ও নদীর মতই বহমান।

যে বনভূমি ও বনসম্পদ তাঁদের কাছে মাতৃদুগ্ধ সম ছিল, সেই অরণ্যময়ী মা-কে নির্বিচারে নিধন করার ফলে আদিবাসী সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি মন্থর গতিতে মৃত্যুর মুখে ধাবিত হচ্ছে।এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আগামী প্রজন্ম। ভারতীয় পেক্ষাপটে আদিবাসীদের দুঃখ- দুর্দশা দেখে নীরোদ সি চৌধুরী (N.C Chowdhury) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দি কন্টিনেন্ট অফ সারসি'-তে বলেছেন-

> "মিশরের নীলনদের জলধার নির্মাণের ফলে ঐতিহ্যমন্ডিত মিশরের মন্দিরগুলি যেভাবে ডুবে গেছে, তেমনই অবস্থা হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসীদের, উন্নয়নের ফলে।"[২]

বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসনে আদিবাসী সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিন দিন ধর্ষিত হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে অরণ্যকেন্দ্রিক আদি সভ্যতা। অরণ্যকে দেবীরূপে পূজা করার প্রচলন আমাদের প্রথম শিখিয়েছে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কার। তাই পবিত্র শাল বৃক্ষের সুশোভিত কুঞ্জে সারনা থান/জাহিরা থান (বেদী) তৈরি করেছিল। গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে গ্রামের চারি সীমানায় বড়াম, দুয়ারসিনী, রঙ্কিনী,কুদরা নামে নানা দেব-দেবীদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সারনা থানে আদিবাসীদের প্রধান দেবতা মারাংবুরু-কে বেশ ধুমধাম সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অন্যান্য দেবী দেবতার রূপে মড়েকো, তুরুইকো, জাহেরা এরা, গোঁসাই এরা রয়েছে; যাদের নিভৃত জঙ্গলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম নির্মাণ করা হয়েছিল। দেবী-দেবতার সন্তুষ্টিকরণের ভার নাইকি/লায়া, দেহরী/দেশউলি/পাহান অর্থাৎ পুরোহিতদের হস্তে দেওয়া হয়েছিল। বনদেবী-কে কেন্দ্র করে জঙ্গল ঘেরা গ্রামগুলি উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত ধামসা মাদল-এর তালে নৃত্য-গীতের সমারোহে এই বনভূমিকে আরও আপন করে নিয়েছে।তাঁদের সুখ-দুঃখের সাথি এই অরণ্য আজ ক্রমাগত সভ্য-সমাজের অর্থলোলুপ আগ্রাসনে প্রতিনিয়ত আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে, বিলুপ্তির পথে আদিবাসী

জীবন-জীবিকা, সমাজ ও সংস্কৃতি। ছায়াবৃত অরণ্য, নদী, পাহাড়, ঝর্ণা সকলেই আজ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। কথা প্রসঙ্গে কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ লিখেছেন –

"কাককৃষ্ণ হ্রস্বাঙ্গ হ্রস্বাবাহ মহাহনু,
হ্রস্বাপানি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্ধজ" -

ভগবত পুরাণ ভারতের আদিম অধিবাসীকে সবদিক দিয়ে হ্রস্ব করে ছেড়েছেন।[৩] এই উক্তি থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, আর্য জাতি স্ব-গৌরবের যশে অনার্য তথা আদিবাসীদের পদানত করে রেখেছে। ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসী হয়েও আজও কোনঠাসা তাদের শিল্প, সাহিত্য ও ভাষা। সমুদ্র মন্থনের ফলে উত্থিত অমৃত রুপ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা কৌশলগত ভাবে অধিকার করে নিয়েছে আর্য তথা আধুনিক সভ্য মানুষেরা। অপরপক্ষে গরল রূপে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, দারিদ্র, বৈষম্য, অনাদর পেল আদিবাসী সমাজের মানুষেরা। বাস্তবে তাঁরাই আজ সংখ্যালঘু। অন্ন,বস্ত্র বাসস্থান পেলেও আজও তারা বঞ্চিত শিক্ষা থেকে। শিক্ষা খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও আজও বহু আদিবাসী মানুষেরা নিরক্ষর। অনাহার, অপুষ্টি, যক্ষা, গলগন্ড ও চর্মরোগ তাদের নিত্য সঙ্গী। এখনো অনেক আদিবাসী এলাকায় দুরারোগ্য ব্যাধিকে বনদেবীর অভিশাপ রুপে স্বীকার করা হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিবাসী বিদ্রোহ নির্মম অত্যাচারের এক করুন উপাখ্যান। বল পূর্বক ও কৌশলগতভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের চাষযোগ্য জমি, কেটে ফেলা হয়েছে জঙ্গল, হস্তান্তরিত হয়েছে ভূমি। এর ফলে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে তাঁদের স্ব-পরিচয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আদিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিনত করে একঘরে করে রেখেছিল। জঙ্গলমহলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর পরিস্থিতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড. সেন লিখেছেন—

> "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে সাঁওতালদের জমিজমা সব হাতছাড়া হয়। তাঁদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যা সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্তরকে আঘাত করে।"[৪]

এক দিকে ভূমিহীন ও অপরদিকে অর্থহীন হওয়ায় তারা কৃষি মজুরের কাজ করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনকে তারা দিকু (শত্রু) নামে চিহ্নিত করে এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার, নীলকর সাহেব, জমিদার, মহাজন ও সুদখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বীরভূমের মাটি থেকে ১৮৫৫ সালে ৩০শে জুন বিদ্রোহ ঘোষণা করে আদিবাসী সাঁওতাল গোষ্ঠী। সিধু কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। বিরসা মুন্ডার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'জঙ্গল আমাদের' এই স্লোগান। উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ গুলি হল পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এছাড়াও আসামের খাসিয়া বিদ্রোহ, নাগা বিদ্রোহ, আরোর বিদ্রোহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতের ইতিহাসে একনিষ্ঠ ছাত্র ও লোকসংস্কৃতি বিদ্ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর অতি সুপরিচিত 'সাঁওতাল গণ সংগ্রামের ইতিহাস' -গ্রন্থে বলেছেন প্রকৃতির কোলে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা বড় হয়, শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে তখন তাঁদের কণ্ঠে জাগে বিচিত্র সংগীত –

"বিড় নাড়গে নাওআ অডাঃক' কঃক' আলাং
রাজারানি নন্ডে আলাং কংক' আলাং
রেঙ্গেচ জালা দলাং এড়ের গিডিয়া,
সের্মা রেয়াঃক' সুকলাং ভুঞ্জা সুকজংআ।"
অর্থাৎ,
"এ বনভূমিতে আমরা ঘর বাড়ি তৈরি করব
রাজা রানী হয়ে আমরা থাকবো,
জগতের দুঃখ কষ্ট আমরা ভুলে যাব
স্বর্গীয় আনন্দ আমরা উপভোগ করব।"[৫]

প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রস্ফুটিত সরল শান্ত আদিবাসীদের জীবন আজ দুর্বিসহ। ইট পাথরের প্রাসাদ তৈরির কাজে নদীগর্ভ দিন দিন খালি হচ্ছে, নির্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে অরণ্য ও নদীমাতৃক সভ্যতা। ইট প্রাসাদের সভ্যতার আগ্রাসনে মানুষ আজ গৃহবন্দি, হাঁপিয়ে উঠেছে শান্ত স্নিগ্ধ প্রাণ। এই গৃহবন্দী জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সভ্য ও সুশিক্ষিত মানুষদের একদিন অরণ্যময়ী মায়ের কাছে মাথা নত করতেই হবে। গ্রহণ করে নিতেই হবে অরণ্যকেন্দ্রিক আদি সভ্যতাকে। তাই ভাবাবেগ থেকে বলতে ইচ্ছা করে—

"আদি ভারতের আদি সমাজ, সভ্যতা আজ বিপন্ন।
সভ্য বলে করে বড়াই, তারাই যে আজ জঘন্য।।"

আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি ও উৎসব :

যে কোন জনজাতি সম্পর্কে জানতে হলে সর্বপ্রথম তাঁদের সমাজ জীবন সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ সমাজ জীবনের মধ্যে অন্তর্হিত আছে সংস্কৃতি ও ধর্মানুষ্ঠান। সংস্কৃতি ও ধর্মানুষ্ঠান যে কোন জাতির গৌরব ও পরম্পরাকে বহন করতে সক্ষম। এই সংস্কৃতির দ্বারাই জাতি তাঁর আপন পরিচয়কে তুলে ধরে। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল ও ডুয়ার্সে ওঁরাও জনজাতির জীবনচর্চা সাধারণ মানুষের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। সাঁওতাল ও ওঁরাও জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও উৎসব বেশ বৈচিত্র্যময় ও মৌলিক। দুই জনগোষ্ঠীর মানুষ অরণ্যকেন্দ্রিক হলেও তাঁদের সমাজ জীবন, আচার অনুষ্ঠান, জীবন জীবিকা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে নানান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সাঁওতাল সমাজে আদিমানব পিলচু হারাম ও আদিমানবী পিলচু কুড়ির সাতজন পুত্র ও সাতজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি গোত্র এবং পরবর্তী আরো পাঁচটি গোত্র যুক্ত হয়ে মোট বারোটি গোত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রতিটি গোত্রের নির্দিষ্ট দেবতা রয়েছে এবং সেই দেবতাদের তাঁরা মন প্রাণে মান্যতা দেয়। গোত্র অনুযায়ী তারা হলেন[৬] –

গোত্র	**দেবতা**
হাঁসদা	হাঁস
মুর্মু	নীল গাই
সরেন	হরিণ
মান্ডি	খরদা নামক ঘাস
টুডু	অজ্ঞাত
হেমব্রম	সুপারি
পাটুরিয়া	পায়রা
বেসরা	বাজপাখি
চড়ে	গিরগিটি
কিস্কু	শঙ্খচিল
বাস্কে	পান্তা ভাত
বেদেয়া	অজ্ঞাত

অপরপক্ষে, ওঁরাও-রা তাঁদের গোত্র সম্পর্কে বেশ সচেতন এবং গোত্রকে সমান গুরুত্ব দেয়। ওঁরাও-রা তাঁদের অধিকাংশ গোত্রই বিভিন্ন জীবজন্তু ও গাছপালা থেকে পেয়েছে এবং এগুলি তাঁদের ধর্মীয় প্রতীক। ওঁরাও-রা গোত্রকে 'টোটেম' - নামে অভিহিত করেছে। তাঁরা বিশ্বাস করে যে, তাঁদের পূর্বপুরুষগন এই সকল জীবজন্তু ও গাছপালা দ্বারা উপকৃত ছিল; তাই গোত্র গুলির নামকরণ এরূপ হয়েছে। গোত্র অনুযায়ী তারা হলেন[৭] —

গোত্র	**দেবতা**
কাচুয়া	কচ্ছপ
কটাক	বন বিড়াল
কাওয়া	কাক
কিন্দুয়ার	এক রকম মাছ
কুজুর	'কুচ' - নামক একপ্রকার গাছ
এক্কা	কচ্ছপ
খয়	খরগোশ
খালকো	এক রকম মাছ
খাঁখা	কাক
খেস	ধান
খাজর	কচু
নিদি	শকুন
টোপ্-পো	কাঠঠোকরা পাখি
টিরকি	ইঁন্দুর
বারলা	বটগাছ

সাঁওতাল ও ওঁরাও দের সমাজ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক। পিতা ছিল পরিবারের প্রধান নিয়ন্ত্রক।পূর্বপুরুষদের নাম অনুসারে ওঁরাও-দের পোশাকি নাম রাখা হত। তবে ডাক নাম রাখা হতো জন্মবার হিসাবে; যেমন-সোমরা,মংরা, বধুয়া,বিথাইয়া শুক্রা, শনিচারোয়া, এতোয়া (রবি) ইত্যাদি। মেয়েদের নাম রাখা হতো গহনার নাম অনুসারে, যেমন লোলো, বিন্দিয়া (টিপ), বিন্দিত (কনভিরণ) ইত্যাদি। তবে বর্তমানে আর এ ধরনের নাম রাখা হয়না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় নামকরণে অধিকাংশ পরিবর্তন ঘটেছে। আবার সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু পরম্পরাগত বৃত্তি ছিল গোত্র অনুযায়ী, যেমন - সোরেনদের সৈনিকের কাজ টুডুদের কশাদের কাজ, মূর্মূদের পুরোহিতের কাজ ও মান্ডিরা কৃষি কাজে নিযুক্ত ছিল। তবে এই গোত্র বিন্যাস বৃত্তি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। সাঁওতাল সমাজে দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। এখানে সাতজন পদস্থ ব্যাক্তি- মাঝি (পঞ্চায়েত প্রধান), পারানিক (সহকারী প্রধান), জগমাঝি (মাঝির সহকারী), জগ-পারানিক(জগমাঝির সরকারী), নায়েক (গ্রাম পুরোহিত), কুড়ুর নায়েক (পুরোহিতের সহকারী) এবং গোডেৎ (পঞ্চায়েতের বার্তা বাহক)। গ্রামের সর্বময় কর্তা হল -'মাঝি'। মাঝি গ্রামের ভালো মন্দ দেখাশোনা করে থাকে। অন্যান্য আদিবাসী মেয়েদের মতো ওঁরাও মেয়েরাও অলংকার পড়তে ভালোবাসে। মূলত দারিদ্র্যের কারণে দামি অলংকার দেখা যায় না। পেতল বা রুপোর অলংকারই বেশি প্রচলিত। চুড়ি, নাকছাবি, কানের দুল, গলার মালা বা হার প্রভৃতি সবই তারা পরিধান করত। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা ব্যবহার করত সোনার গহনা। উৎসব মুখর দিনগুলিতে ওঁরাও মেয়েরা কন্দ ফুল বা পাহাড়ী ফুল দিয়ে কবরী সজ্জিত করত। তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাধারণ মানের, ওঁরাও পুরুষেরা গামছা বা বড়জোর ছয়-সাত হাতের মোটা ধুতি পড়ত। মেয়েরা পড়তো তাঁতে বোনা মোটা সুতোর শাড়ি। ব্লাউজ বা সায়ার ব্যবহার খুব একটা ছিলনা; লজ্জা নিবারণ বা শরীর ঢাকার মতো এক টুকরো কাপড়-ই ছিল যথেষ্ট। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষেদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এখনো অনেকখানি দুর্বল; বিশেষ করে বনভূমির পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি। বনভূমির বনজ সম্পদ তাঁদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র ভরসা। বনভূমি থেকে প্রাপ্ত শালপাতা, কেন্দুপাতা, বেতকর্ম পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করে থালা, বাটি, ঠোঙ্গা বানিয়ে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। দ্বিতীয়তঃ বন থেকে আম, জাম, খেজুর, কাঠ, মধু ও ভিন্ন ধরনের ফুল সংগ্রহ করে বাজার জাত করে। খাদ্য হিসাবে আদান ছাতু,পুটকা ছাতু,পল ছাতু ও মোতাম ছাতু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তৃতীয়তঃ-বাঁশ থেকে তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প,

খেজুর পাতা শুকিয়ে তালাই, মাদুর কাঠি দিয়ে তৈরি করে মাদুর, যা তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম রূপে পরিগণিত হয়। তবে বেশিরভাগ সাঁওতাল অধিবাসীরা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত; এরা সাধারণত বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে থাকে। ধান, গম, ভুট্টা, যব, বাজরা ইত্যাদি চাষের সঙ্গে শাকসবজি, খাদ্যশস্য চাষ করে থাকে। অন্যদিকে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে বসবাসকারী সাঁওতালরা নদী-নালা থেকে মাছ, কাঁকড়া সংগ্রহ করে জীবন অতিবাহিত করত। এক কথায় বলা চলে সাঁওতালদের জীবনযাত্রা ছিল অরণ্য ও কৃষি নির্ভর। অপরপক্ষে, ওঁরাও গোষ্ঠীর মানুষদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ডুয়ার্সের চা শিল্প। মূলত বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের বাসিন্দা ওঁরাও গোষ্ঠীর মানুষরা কাজের প্রয়োজনে ডুয়ার্সে আসে এবং চা চাষে যুক্ত হওয়ার পর তারা এখানে রয়ে যায়। বংশপরম্পরা ডুয়ার্সে থাকার ফলে তাঁরা এখানকার অধিবাসী হয়ে যায়। আদিবাসীদের মধ্যে ওঁরাও সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। তবে বাকিরা নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিতে ভালোবাসে এবং সংস্কৃতি হারিয়ে অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী আজ হিন্দুত্ববাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে।সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের মতে –

> "বাংলাদেশে এমন কয়েকটি সমাজ আছে যারা কোন কালে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজই ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে উপজাতীয়ত্ত এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কোন নিদর্শন নেই তারা ধর্মে ভাষায় ও সামাজিক আচারে হিন্দু হয়ে গেছে সুতরাং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে এরা আদিবাসী হলেও সামাজিক দিক দিয়ে এরা আজ হিন্দু।"[৮]

সনাতন ধর্মে জগতের কল্যাণ সাধন ও নিজ মুক্তির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত রীতিনীতি বা আচার অনুষ্ঠান সকলে মিলেমিশে পালন করা হয়, তাই ধর্মানুষ্ঠান। ধর্ম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকলে যেন এক বিন্দুতে মিলিত হয়। ঠিক তেমনি সাঁওতালদের প্রধান উপাস্য দেবতা সিং বোঙ্গা অর্থাৎ সূর্য দেবতাকে কেন্দ্র করে সকল গ্রামবাসী উৎসবে সামিল হয়। মারাংবুরু অর্থাৎ পর্বত দেবতা, সাঁওতালদের গ্রাম দেবতা রূপে পুজিত হয় এই মারাংবুরু। আপামর বাঙ্গালীদের মতোই সাঁওতাল সমাজেও বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। এদের উৎসব গুলি নাচ গানের সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ফাল্গুন মাসের নববর্ষে অনুষ্ঠিত হয়- স্যালসাই, চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় বোঙ্গাবোঙ্গী, আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয় দাঁসায়, হেমন্তে অনুষ্ঠিত হয় - সোহরাই, সোহরাই হচ্ছে ফসলের দেবতা। নাচ গান ও বাদ্যযন্ত্রের সমারোহে ফসলের দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। বসন্তে অনুষ্ঠিত উৎসব বাহা নামে খ্যাত; নানা রঙের ফুল ফোটার সৌন্দর্যকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উৎসব রয়েছে যেমন পাতা পরব, ছাতা পরব, জাতা পরব প্রভৃতি বেশ উল্লেখযোগ্য। অপরপক্ষে ওঁরাও জনগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রকৃতির পূজারী প্রকৃতির প্রধান পুরুষ দেবতা ধরমেশ হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রখ্যাত লেখক J.G Frazer তাঁর 'The Worship of Nature' - গ্রন্থে লিখেছেন—

> "Dharmesh the supreme God of the Draons, menifested in the Sun."[৯]

ওঁরাও-রা প্রার্থনা ও উৎসর্গের মাধ্যমে সূর্য দেবতার পূজা করে। ওঁরাও গ্রামের প্রধান দেবী হল 'সরণ কুড়িয়া' আম্রকুঞ্জে তাঁর বাস। এই দেবীর গায়ের রং ফর্সা, মাথার চুল সাদা সনের মত। শিকারের দেবতা হল চন্ডী, শিকারে যাবার পূর্বে তাঁরা চন্ডী দেবতাকে স্মরণ করে বের হত। এছাড়াও অন্যান্য ধর্ম অনুষ্ঠান গুলি হল কার্তিকী অমাবস্যায় সোহরাই বা বাঁধনা দেবতার পূজা করা হয়। গরুকে ভালো মতো স্নান করিয়ে তেল সিঁন্দুর মাখিয়ে ভালো খাবার খেতে দেওয়া হয়, এটি কৃষি বিষয়ক পূজা। বসন্ত উৎসব বা শারহুল পূজা যা প্রধানত মার্চে শেষ থেকে এপ্রিলের শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও রয়েছে গ্রাম বান্ধা পূজো, কর্ম পর্ব বা জাওয়া (ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের বিজয়া দশমী পর্যন্ত এই উৎসব হয়) এবং আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীর দিন জিতাষ্টমী পূজা বা জিতিয়া পরব্ পালন করা হয়। করম পরব কুমারী ব্রত ও জিতিয়া বিবাহিত নারীদের ব্রত। করম ও জিতিয়া দুটি ব্রতই উর্বরতা, প্রজনন ও কৃষি সম্পর্কিত পুজো।

গর্ভধারণ ও জন্ম :

আদিবাসী সমাজে গর্ভধারণ সম্পর্কে বেশ মতভেদ ছিল যৌন ক্রিয়ায় যে নারী গর্ভবতী হয় এ ধারণা তাদের ছিল না তাঁরা মনে করতো গাছের পাতা ফলমূল ইত্যাদি খাবার ফলে নারীরা গর্ভবতী হয় আবার এও মনে করা হয় অপদেবতা বা দেবতার সঙ্গম রীতির কারণেও গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। কালক্রমে কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে তারা বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছে আজ আদিবাসী সমাজে কোন নারী প্রথম গর্ভবতী হলে বাড়ির মেয়েরা যেমন দায়িত্বশীল ও যত্নবান হয় তেমন বাড়ির পুরুষ সদস্যরা কর্তব্য পরায়ন হয়ে থাকে। প্রথম সন্তান গর্ভে এলে তাকে পূর্বপুরুষের আত্মা, ভুত পেত ও অপদেবতার হাত থেকে রক্ষার জন্য শুকর বা ভেড়া বলি দেওয়া হয়। আবার গর্ভবতী অবস্থায় রমনী যদি বাইরে যায়, সে ক্ষেত্রে আপাদমস্তক শাড়ি জড়িয়ে যেতে হয়। এই অবস্থায় কবরস্থান যাওয়া ও মৃতদেহ স্পর্শ করা নিষেধ। সহজে প্রসব না হলে মনে করা হয় কোন দুষ্টু আত্মা বা দুষ্ট লোকের নজর পড়েছে তখন ঘরের যাবতীয় ঢাকনা খুলে রাখা হয়। প্রসবকাল আসন্ন হলে ঘরে কয়েকজন বয়স্কা মহিলা ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে না প্রসবের সময় জননী পেছনদিকে হেলে হাঁটুর ওপর বসবে কোন বয়স্ক মহিলা তার পেছন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে জননীর পশ্চাৎ ভাগ ধরে রাখবে অপরদিকে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে স্নান করানো হয়। কখনো কখনো চাল ভেজানো জল দিয়ে স্নান করানো হয় নাড়িছেদনের পর সদ্যজাতকে নরম বিছানায় শুয়ে রাখা হয়, এরপর বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা আসে সদ্যজাত শিশুকে দেখতে এদের শিশুরাই তথাকথিত সভ্য সমাজের তুলনায় প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়। এর ফলে ওইসব শিশুদের ইমিউনিটি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বিবাহ অনুষ্ঠান :

বৈদিক তথা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় 'বিবাহ' একটি অন্যতম সামাজিক অনুষ্ঠান। মানব জীবনে বিবাহ এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। বিবাহের দ্বারা দুটি মানুষ (স্বামী ও স্ত্রী) যেমন একাত্ম হয়, ঠিক তেমনি দুটি পরিবারের মধ্যে গড়ে ওঠে এক মধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। বিবাহের মাধ্যমে একজন নারী ও পুরুষ সাংসারিক জীবন গ্রহণের প্রথম পা রাখে। এই সামাজিক বন্ধন দ্বারা দুটি মানুষ (নরনারী) পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক রূপে থাকার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। নারী ও পুরুষের বৈধ যৌনমিলন, তাদের সামাজিকীকরণ, সন্তান উৎপাদন, গোষ্ঠী রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান মেনে স্বামী-স্ত্রী রূপে একসাথে জীবন অতিবাহিত করার ছাড়পত্রকে বিবাহ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর্য সামাজিক বিবাহ রীতি অপেক্ষা আদিবাসী বিবাহ রীতি, আচার অনুষ্ঠান অনেকাংশেই আলাদা। সেই পুরাতন রীতি মেনে চলে আদিবাসী সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান। তবে বর্তমানে আধুনিক বিবাহ রীতির প্রভাব আদিবাসী বিবাহে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আদিবাসী সমাজে এই পরিবর্তন আনয়ন করার ফলে বিবাহ রীতি-নীতির মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা একেবারেই কাম্য নয়। দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে আদিবাসী সংস্কৃতির পূর্ণ সত্তা। বিবাহের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন "বিশেষ রূপে বহন করা" থেকে বাঙ্গলা বিবাহ শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ বিবাহযোগ্য কন্যাকে বিশেষ রূপে বহন করে এনে স্ত্রী মর্যাদা দেওয়া হত। সাঁওতাল পরিভাষায় এই বিবাহকে বলা হয় 'বাপলা'। এই বাপলা শব্দের উৎপত্তি √বাপ+লা > বাংলা (অঘোষীভবন), যার প্রচলিত অর্থ দাবি দাওয়া, দান বা দেনা- পাওনা আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা। আদিবাসী তথা সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু বিবাহ পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে প্রথাগত বিবাহ রীতির পাশাপাশি প্রথা বহির্ভূত বিবাহ রীতিও দেখা যায়। সাঁওতাল সমাজের বিবাহ পদ্ধতি গুলি হল টুংকি দিপিল বাপলা, রাঁড়ি ছাড়ুই বাপলা, ঞির হলঃ বাপলা, ইপুতুৎ সিঁদুর বাপলা, ছুটকি জঙ বাবলা, হিরোম বাঁইহা বাপলা এবং আপাঙগির বাপলা। সাঁওতালদের বিবাহ পদ্ধতির পাশাপাশি কুড়মিদের বিবাহ পদ্ধতি ও বেশ আকর্ষণীয়। যেমন- শিক্ষানবিশিবিবাহ, অনুপ্রবেশ বিবাহ, পালিয়ে বিবাহ, রাজি খুশি বিবাহ, সেবা বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ এবং সম্বন্ধ বিবাহ ছাড়াও রয়েছে বরকেনা বিবাহ প্রথা। তবে বর্তমান সময়ে পালিয়ে বিবাহ, রাজি খুশি বিবাহ ও সম্বন্ধ বিবাহের প্রচলন বেশি। বলা বাহুল্য বরকেনা বিবাহ এখনো উঠে যায়নি।

প্রথম - ত্রিপুরার হালাম ও কুকি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শিক্ষানবিশি বিবাহ দেখা যায়। এই বিবাহের রীতি হচ্ছে একজন যুবক তাঁর পছন্দমতো কোন যুবতীর সাথে বসবাস শুরু করে স্বামী স্ত্রীর রূপে এবং তা যুবতীর বাড়ির অভিভাবকের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পন্ন হয়। এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ একত্রে বসবাস করার পর যদি যুবতী পুরুষটির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিবাহের সম্মতি জানালে সামাজিক বিবাহ অনুমোদন করে অভিভাবক ও সমাজপতি 'রায়' 'গাবুর' ও গালিম'রা। অপরপক্ষে যুবতী যদি পাত্রকে অযোগ্য বিবেচনা করে, তবে পাত্রপক্ষকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই ধরনের বিবাহকে শিক্ষানবিশি বিবাহ বলা হয়। দ্বিতীয় - সাঁওতাল, মুন্ডা, কুড়মি, খাড়িয়া, বিরহোড়, ভূমিজ, লোহার, বড়াইকা, রাওতিয়া প্রকৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'সিঁদুর ঘষা' - বিবাহ রীতির প্রচলন আছে, যা মূলত ছোটনাগপুর মালভূমির ভূ-সংলগ্ন অঞ্চল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, কেঁওন ঝোড়, সুন্দরগড় জেলাতে চোখে পড়ার মতো। অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে বলপূর্বক সিঁদুর পড়িয়ে দেওয়া; যা মূলত দিবালোকে হাটে, বাজারে বা মেলাতে হয়ে থাকে। অশান্তি ও কলহ বিবাদ এড়ানোর জন্য যুবকটি পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ওই কন্যার জন্য আর 'বর' লাগেনা। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিবাহকে সিদ্ধ বলে গ্রহণ করা হয়। এই বিবাহ রীতিকে ট্যানে বিহা বা বলপূর্বক বিবাহ বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় - আজ থেকে বহু বছর পূর্বে তৎকালীন সময়ে অবস্থাপন্ন অভিভাবকের বাড়িতে বাগাল বা মুনিষ হিসাবে কাজ করার সুবাদে সেই বাড়ির কোন কন্যার সাথে বিবাহ সম্পন্ন হতো; এই বিবাহ রীতিকে বলা হয় বিনিময় বিবাহ বা শ্রমদান বিবাহ। অর্থাৎ শ্রমদানের মাধ্যমে কন্যাকে বধূরূপে পাওয়া। ভাবী বধূর কাছে ওই পুরুষ 'লাগসেনা' নামে পরিচিতি পায়। এ প্রকার বিবাহ সাঁওতাল, মুন্ডা, হো-সহ, বংচের, কাইপেঙ্গ, কলই সমাজে প্রচলিত ছিল। চতুর্থ - পালিয়ে বিবাহ বা অপহরণ বিবাহ আদিবাসী সমাজে বহুল প্রচলিত। কোনো যুবতীর অভিভাবক যদি বিবাহে সম্মতি প্রদান না করে, তবে যুবকটি তাঁর কন্যাকে অর্থাৎ পাত্রীকে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করে। এ রকম বিবাহকে অপহরণ বিবাহ বলা হয়ে থাকে। দুই এক মাস একসঙ্গে থাকার পর গ্রামে ফিরে এলে উভয় পক্ষের অভিভাবকেরা ধুমধাম করে এই বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়। পঞ্চম - বীরহোড়, হো, মুন্ডা, কুড়মি ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুপ্রবেশ বা ঢুকু বিবাহের প্রচলন রয়েছে। এই ঢুকু বিবাহ অন্যান্য বিবাহ রীতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এই বিবাহে কোন যুবতী তাঁর কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে জীবনসঙ্গী রুপে পাওয়ার জন্য বিবাহে অনিচ্ছুক ওই পুরুষটির বাড়িতে বলপূর্বক অনুপ্রবেশ করে বসবাস শুরু করে। এবং বসবাস কালীন সময়ে যুবতী মেয়েটির উপর কোন অন্যায় অত্যাচার হলেও তা সহ্য করে নেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি ওই পুরুষটি যুবতীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন তাকে ঢুকু বিবাহ বা অনুপ্রবেশ বিবাহ বলা হয়। ষষ্ঠ - শাস্ত্রমতে যে বিবাহকে গান্ধর্ব আখ্যা দেওয়া হয়েছে,তারই রূপান্তর 'রাজিখুশি' বিবাহ। উদাহরণস্বরূপ রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ। সপ্তম - বৈদিক যুগ থেকে এখনো পর্যন্ত সম্বন্ধ বিবাহের প্রচলন রয়েছে। আদিবাসী সমাজেও এই বিবাহ সর্বাধিক প্রচলিত রীতি। বিবাহের মাধ্যম হিসাবে যেমন ঘটক রয়েছে, তেমনি আদিবাসী সমাজে রয়েছে 'রায়বার'। এই রায়বার উভয় পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বিবাহকে সুসম্পন্ন করতে পূর্ণ সহযোগিতা করে। অষ্টম - যৌবনের তাড়নায় কোন অবিবাহিতা কন্যা যদি অন্তসত্তা হয়ে পড়ে, তখন ভাবি সন্তানের পিতৃ পরিচয় দেওয়ার জন্য কন্যার পিতা ও সমাজপতিরা 'বর কেনা'- বিবাহের আয়োজন করে। এই বিবাহে কন্যার পিতা যথেষ্ট অর্থ ও ভূসম্পত্তি দিয়ে বর কেনে। এবং এই বর কেনা বিবাহের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটি পায় স্বামী ও ভাবী সন্তান পায় পিতৃস্নেহ ও বংশ পরিচয়।

বিবাহের আচার অনুষ্ঠান :

যেকোনো জনগোষ্ঠীর কাছে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। বিবাহের রীতি, আচার ও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের দ্বারা কোন জাতি তাঁর স্ব-পরিচয়কে তুলে ধরে। এক এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক এক ধরনের মৌলিক বৈচিত্র দেখা যায়। তেমনি আদিবাসী সমাজের কুড়মি গোষ্ঠীর বিবাহ ব্যবস্থা বেশ আকর্ষণীয়। বাগমুন্ডি থেকে শুরু করে ময়ূরভঞ্জের মুরুডা থানার চিতোরা, মাকুন্দ, পলাশবধা গ্রাম ও পুরুলিয়ার ঝালদা অঞ্চলে কুড়মি সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠান বেশ চোখে পড়ার মতো। কুড়মি সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের নাচ-গান লোকাচার সমস্ত কিছুকে একত্রে বলা হয় 'ষোল

সগুনের বিহা'। 'রায়বার' বা 'আগুয়া পেছুয়া' - মারফত বিবাহযোগ্য কন্যার সন্ধান নেওয়া হয়। পাত্রপক্ষ নির্দিষ্ট দিন স্থির করে পাত্রী দেখতে বের হয় খুব ভোরবেলায়। রওনা অভিমুখে যদি কোন অশুভ লক্ষণ দেখা যায়, যেমন কাকের মুখে হাড় থাকা, বেড়াল ডান দিক দিয়ে রাস্তা কাটা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা গেলে যাত্রা বাতিল বলে গণ্য হয়। পাত্রী পছন্দের পর পাত্রী কতটা লক্ষ্মীগুনা সম্পন্না তা পরীক্ষা করে দেখা হয়। সূর্য ওঠার আগের মুহূর্তে ভাবী ননদ বা দেওর পুকুর থেকে জল এনে তুলসী থানে কাঁসার 'ডুঙাতে' রাখে। 'বুড়ী বন্দনা'- উৎসবের জন্য রাখা ধানের শিষ থেকে নখ দিয়ে খুঁটে তিনটি চাল বের করা হয় বর,কনে ও ধর্ম দেবতার নামে। বরের নামে রাখা চালটি কাজল দিয়ে, পাত্রীর নামে রাখা চালটি সিঁদুর দিয়ে, ও ধর্ম দেবতার নামে চালটিতে কোন কিছু মাখানো হয় না। এরপর ওই তিনটি চাল 'ডুভার' জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই চাল তিনটি জলের মধ্যে কেমন ঘুরছে তা বেশ ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। বরের নামে প্রতীকি চালটি যদি প্রথমে ধর্মকে এবং পরে কন্যার নামে প্রতীকি চালটির সঙ্গে মিলিত হয় তবে সেই বিবাহে শুভযোটক অনুমান করা হয়। কন্যার নামে প্রতীকি চালটি প্রথমে ধর্মদেবতাকে ও পরে বরের প্রতীকি চালের সাথে মিলিত হলে কন্যার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। যদি বর কনের প্রতিকী চাল দুটি পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার পর ধর্ম দেবতার প্রতীকী চালের সাথে মিলিত হলে বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি প্রতীক চাল গুলি পরস্পরের সাথে মিলিত না হয়ে ডুবে যায় তবে তা অশুভ এমনকি বর কনের অপমৃত্যুর প্রবল সম্ভবনা, তাই এই কন্যা পরিত্যক্তা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সমাজে আমরা যেমন জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সাহায্যে যোটক বিচার, গন বিচার দ্বারা বিবাহের শুভ-অশুভ নির্ণয় করি, তেমনই তৎকালীন সময়ে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা বিবাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বেশ সচেতন ছিল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা পেলাম। কন্যা নির্ধারিত হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে কন্যাকে আশীর্বাদ বা দুয়ার খাঁদা অনুষ্ঠান করা হয়। কন্যার বৌদি এক ঘটি জলসহ আম ডাল হাতে নিয়ে জল ছিটিয়ে অতিথিদের বরণ করে। এই দুয়ারখাঁদা অনুষ্ঠানের জন্য গ্রামের মাহাতো-র অনুমতি একান্ত প্রয়োজন হয়। এরপর বরকর্তা বরকে হাজির করে এবং বরকে ছড়ার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করা হয় —

"কাঁহলে আইলাহি তুঁই, কাঁহা তোর ঘার,
কন ঝাড়েক বাঁশ তুঁই, কন বাঁশেক শর।"

উত্তর দিলে বোঝা যাবে বর কঁকা(বোবা) না কালা, বর রসিক হলে হাসতে হাসতে জবাব দেয়। বিবাহের দিন 'পনবসা' টাকা সহ হলুদ দূর্বাঘাস, আতপ চাল সহ কন্যার বাড়িতে 'লগন' পাঠানো হয়। 'লগন' - যাবার পর বিবাহের বাজনা বাজানোর জন্য ডোম, ঘাসী, কাজল লতা ও যাঁতির জন্য কামার; নতুন সার-ভার হাঁড়ি, নতুন চুকার জন্য কুমোর, আলতা পড়ানো ও নখ কাটার জন্য নাপিত, আম্ল-খাওয়া সুতোর জন্যে তাঁতি, ক্ষার-শুদ্ধির জন্যে ধোপাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয় সুপুরি মারফত। আত্মীয়-স্বজনদেরও নিমন্ত্রণ করা হয় সুপুরি মারফত। বিবাহ উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে বরকে কেন্দ্র করে 'আমবিহা' অনুষ্ঠান করা হয়। বরের হাতে আমপাতা দিয়ে 'কাঁকনা' বাঁধেন বরের জামাইবাবু। আম অমৃত ফল, আমের কুশী যৌবনের প্রতীক। উপবাসী বরের মা, পিসি, মাসিরা আম গাছের নিচে বরকে কোলে বসিয়ে অত্যন্ত আদর করে শেষবারের মতো বরের এঁটো খায় আমভেপুর ও গুড়ের সাহায্যে। বিবাহ উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পূর্বে বর শেষবারের মতো মায়ের স্তন পান করে। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'দুধের ধার শোধ' অনুষ্ঠান। এরপর বিয়ের পিঁড়িতে অনুষ্ঠিত হয় 'সিনই বদল' অনুষ্ঠান। বাঁশের ডালাতে বসিয়ে কন্যাকে বিবাহ মণ্ডপে আনা হয়, পরনে তাঁর হলুদ মাখানো শাড়ি। এবার পাত্র সকল গুরুজনদের থেকে অনুমতি নিয়ে কন্যার সিঁথিতে পাটের বা শনের সঙ্গে সিঁদুর মিশিয়ে সিন্দুর ঘষে দেয়। তখন উপস্থিত সকলের 'হরিবোল ভাই হরিবোল' ধ্বনি দিতে থাকে। পরদিন সকালে কন্যা বিদায়ের পূর্বে কনের আত্মীয়-স্বজন থালা, বাটি, ঘটি, ডুভা, গাগরা, বালতি এবং টাকা দিয়ে বর-কনেকে আশীর্বাদ করে। এরপর বরকে ভিতর ঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে দেওয়া হয়। খাবার সময় বর রুষ্ট হলে তাঁকে তুষ্ট করার জন্য হাতঘড়ি, সাইকেল বা অন্য কিছু উপহার দেওয়া হয়। অবশেষে বিদায় পর্বে কনে তাঁর মা-বাবার ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে উল্টোমুখে ধান ছুঁড়ে, এই ঘরভরা অনুষ্ঠানের সময় বিদায়ের গান যে কোন মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে—

"লাল টুপাই গুড় মুড়ি

আর কি মা খাবো,
তোর ঘরে আর কি গো ম্যাঁঞ
বিটি জনম লিব।"

বিদায় বাজনা বেজে ওঠার সাথে সাথে কান্নার রোল উপচে পড়ে, বুকফাটা কান্নাতে ভেঙ্গে পড়া নববধূ মায়ের দিকে তাকিয়ে পালকি আরোহন করার সময় উপস্থিত মেয়েরা গান ধরে—

"মা কান্দেন মাঝ ঘরে ম্যাঞ গো
ফঁফাঞে ফঁফাঞে
দাঁড়া নরেবাজনদ্যারা ভাইরা,
ম্যাঁঞকে ম'র বোধ দিঁয়ে রাখি।"

পারলৌকিক ক্রিয়া :

বাঙালি হিন্দু সমাজের মতোই আদিবাসী সমাজেও পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রচলন রয়েছে। আদিবাসী সমাজে বিশেষ করে ওঁরাও জনজাতির মধ্যে মৃতদেহ সাধারণত কবর দেওয়া হয়, তবে বর্তমানে স্থান সংকলনের অভাবের জন্য শবদেহ দাহ করা হয়। ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা মনে করে পূর্ব-পুরুষদের আত্মা তাদের বংশধরদের বিপদ থেকে রক্ষা করবে এবং সেই উদ্দেশ্যে মৃত আত্মার অন্তোষ্টিকরন করা হয়। আগেকার দিনে বীজ ধান বোনার পর কিংবা মাঠের ধান সংগ্রহ করার আগে কারো মৃত্যু হলে তাঁর শবদেহ কিছুকালের জন্য মাটিতে পৌঁছে দেওয়া হত। পরে ধান গোলাজাত করবার পর এক বিশেষ দিনে সেই মাটি থেকে শবদেহের সমস্ত হাড় বের করে চিতা সাজিয়ে আগুন দেওয়া হত। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'হাড়বোরা' অনুষ্ঠান। বাঙালি সমাজের মতোই আদিবাসী সমাজেও মৃতদেহের চোখে তুলসী পাতা রাখা হয় এবং কবরস্থানে যাবার সময় হরিবোল ধ্বনি দেওয়া হয়। তেরো বা পনের দিনের মাথায় ছেলেরা চুল,দাড়ি, নখ কেটে কামান পর্ব শেষে নতুন জামা কাপড় পড়ে বাড়ি ফেরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে হাড়িয়া পান করানো হয়। ঘাট কাজের পরের দিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। শ্রাদ্ধতে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সকলেই উপস্থিত থাকে। পাহান বা পূজারী ওই দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ পিন্ডদান সম্পন্ন করে। যাই হোক আদিবাসী সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী নিজের আত্মা মানুষের কাছে ভয়ঙ্করী ও শুভঙ্করী দুটোই হতে পারে। তাঁদের বিশ্বাস আত্মা সর্বদাই সক্রিয় ও সঞ্চালনশীল। তাই হিন্দু উচ্চবর্ণের সমাজ যে আচরণ গুলি বৈদিক শাস্ত্রাচার বলে চিহ্নিত করে, তার অধিকাংশই ওঁরাও আদিবাসী সমাজ থেকে অর্থাৎ কৌম সমাজ থেকে গ্রহণ করে শাস্ত্র-শুদ্ধ করবার প্রচেষ্টা বলে অনেকে মনে করে।

উপসংহার :

আজকের আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ যখন বিশ্বকে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে, তখন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সভ্যতার প্রাচীন জনজাতি আদিবাসী মানুষেরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে হয়েছে বঞ্চিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৫ বছর পরও তাঁদের আন্দোলন করতে হয় প্রাপ্য অধিকারের জন্য, যা ভারতবর্ষের বুকে সত্যই নিন্দনীয়। বছরের পর বছর মেলে শুধুই প্রতিশ্রুতি; আর এই প্রতিশ্রুতি বাক্যকে সম্বল করেই তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই। আজও ভারতবর্ষের বুকে এমন অনেক প্রান্তিক এলাকা আছে যেখানকার আদিবাসীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান এই তিনটি মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত। দেশের ছোটবড় শহরতলীতে যখন বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাচ্ছে, ঠিক তখন পাহাড়ী এলাকার আদিবাসীদের তিন-চার কিমি দূরত্ব পায়ে হেঁটে পানীয় জল আনতে হচ্ছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও তাঁরা সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার আলো আদিবাসী সমাজে পৌঁছালেও তা আংশিক, এ বিষয়ে সরকার ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সভ্য মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। তবেই আদিবাসী সমাজ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে এবং তাঁদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক নতুন সূর্যের সন্ধান দেবে। ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসী হয়েও তাঁরা যেন আশ্রিতের মতো জীবন

যাপন করছে, যা সত্যই দৃষ্টিকটূ। এখনো অনেক আদিবাসী মানুষ রয়েছে যাদের কৃষিকাজ,দিনমজুর, চা-শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। জাতিগত ভেদাভেদ, বৈষম্য যা তাঁদেরকে আরো দূরে সরিয়ে রেখেছে, এই শ্রেণীবিভাজন থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চ নিজ ভেদাভেদকে দূরে সরিয়ে সকল আদিবাসীদের আপন করে নিয়ে পথচলা শুরু করতে হবে। তবেই আগামী ভারতবর্ষ জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। তাই এ কথা বলেই উপসংহারের ইতি টানছি —

"মোরা নই কেহ ছোট সকলি সমান।
রেখেছো পশ্চাতে ফেলে দাওনি যোগ্য সম্মান।।"

তথ্যসূত্র :

১. মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, পৃ. ৩১
২. তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭
৩. তদেব, পৃ. ২৯
৪. মন্ডল, অমল কুমার, ভারতীয় আদিবাসী, পৃ. ৩৭
৫. মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, পৃ.৩৫
৬. হাঁসদা, রবীন্দ্রনাথ, গুহিরাম কিস্কু, তনুশ্রী হাঁসদা, (সম্পাদনা), আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃ. ৬৯
৭. তদেব, পৃ. ১৬৩-১৬৪
৮. তদেব, পৃ. ১৫
৯. তদেব, পৃ. ১৬৭